



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 62 - 72

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মানচিত্রের ক্ষত, বিপন্ন অস্তিত্ব ও প্রান্তিক আত্মার অন্বেষণ : উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা ছোটগল্প

হায়দার সেখ

Email ID: hs0122408@gmail.com



Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Northeast India,
Bengali Short
Stories, The
Partition (of
1947), Existential
Crisis, NRC,
Liminal Souls,
Scars of the Map,
D voter.

Abstract

In the long journey of Bengali literature, the writings of North-East India occupy a distinct and sovereign space, independent of the literary trajectories of West Bengal or Bangladesh. These short stories have attained a unique dimension, reflecting the eternal lament of people inhabiting a blood-etched map and their grueling struggle for existence. The 1947 Partition did not merely bifurcate the land; it drew a melancholy line across the geographical and psychological maps of the people, rendering their existence precarious. From this searing anguish emerged a defiant literary stream. Unlike the urban-centric literature of West Bengal or the liberation-war-driven narratives of Bangladesh, the literary sphere here treats 'marginality' not as a theoretical term, but as a harsh daily reality. The nine stories under discussion - 'Abba-janer Haar', 'Bangshir Bhatar', 'Bing O Murgichhana', 'Kalabatir Baromashya', 'Anyopath', 'Anubhav', 'Deola', 'Jalochchwas', and 'Guli Athaba Gulir Shabda'—boldly unveil the scars of this landscape.

The existential crisis of people ensnared in the legal traps of the NRC is vividly portrayed in 'Abba-janer Haar' and 'Anyopath', while 'Bing O Murgichhana' and 'Guli Athaba Gulir Shabda' recount the tragic history of childhoods scorched by war. In 'Kalabatir Baromashya' and 'Bangshir Bhatar', poverty is so visceral that the primal struggle for food becomes the ultimate battle for survival. Conversely, 'Deola' and 'Jalochchwas' capture the erosion of ideals and the somber nostalgia of a vanishing aristocracy. Bimal Choudhury's 'Anubhav' transcends barbed wires and religious boundaries to show a path of supreme human unity. Analyzing these through a theoretical lens, we find the voice of the 'Subaltern', as described by Gayatri Chakravorty Spivak—the marginalized who seek their inevitable identity within this literary realm. When state power prioritizes legal documents over human relationships, the struggle for survival becomes a bloody epic. The wounds of Partition remain embedded in the souls of this region's people; this extreme existential vulnerability has granted North-East Indian Bengali short stories a unique humanistic and political dignity on the global stage.

Discussion

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উত্তর-পূর্ব ভারত এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অবিনাশী চিৎকারের অন্য নাম। কণ্টকাকীর্ণ শিল্পরূপের আবরণে ঢাকা ছোটগল্পগুলো এই অঞ্চলের মানুষের জীবন সংগ্রামের মতোই যেন বৈচিত্র্যময়। এই অঞ্চলের সাহিত্যকে দীর্ঘকাল ধরে কলকাতার সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে ‘প্রবাসী’ বা ‘আঞ্চলিক’ তকমা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সময়ের আবর্তনে উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা ছোটগল্প তার নিজস্ব স্বর ও অগ্নিগর্ভ শরীর নিয়ে বাংলা সাহিত্যের মূল ধারার সমান্তরালে এক শক্তিশালী ও অপরিহার্য অবস্থান তৈরি করেছে। নগর জীবনের একঘেয়েমি বা সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা নিয়ে যখন পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ব্যস্ত, তখন উত্তর-পূর্ব ভারতের গল্পে প্রধান হয়ে ওঠে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা।

অস্তিত্বের এই চরম সংকটের মূলে রয়েছে ১৯৪৭-এর দেশভাগ এবং তারপরে ঘটে যাওয়া রাজনীতির অস্থিরতা। এই প্রসঙ্গে দেবব্রত চৌধুরীর ‘আব্বাজানের হাড়’ গল্পটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গল্পের প্রারম্ভেই আমরা দেখতে পাই ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার সেই সত্যের বানী। বর্তমান ভারতবর্ষে আতঙ্কের অন্য নাম এনআরসি। এনআরসি (NRC) এবং ডি-ভোটার (D-voter) নামক আইনি লড়াই মানুষের আত্মপরিচয়কে হুমকির মুখে তুলে দিয়েছে। তার চরম প্রতিফলন এই গল্প। এই গল্পের প্রধান চরিত্র আমিরুদ্দিন। তার কাছে নাগরিকত্ব কেবল একটি আইনি অধিকার নয়, বরং বেঁচে থাকার শেষ আশ্রয়। আমিরুদ্দিন যখন রাষ্ট্রের কাছ থেকে নাগরিকত্ব প্রমাণের নোটিশ পায়, তখন তার পায়ের তলার মাটি সরে যায়। বন্যায় ভেসে যাওয়া দলিলপত্র আমিরুদ্দিন কীভাবে উদ্ধার করবে তা সে জানে না, তার মনে হয় ঘর পুড়লে হয়তো ছাই পাওয়া যেত কিন্তু ভেসে যাওয়া অস্তিত্ব তার পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সংকটের এই চরম পর্যায়ে এসে সে তার মৃত পিতার কঙ্কালকে নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরতে চায়। গল্পের আমাদের ভাবনাকে অবাক করে দেয় আমিরুদ্দিন সেই উদ্ধৃতি—

“আব্বাজান ... তোমাকে মরণোত্তর দ্বীপান্তরে পাঠাচ্ছি। তুমি যাও, এই দেশ, কাল বীর্ষ জাত সন্তান-পৌত্রের মায়া ছাড়িয়ে-বিড়ুই দ্বীপান্তরে ... তোমার মরণ পূর্ব-জীবনের এই চরম শাস্তি হোক...”^১

এই আতঙ্কিতকার, এটি শুধুমাত্র আমিরুদ্দিনের একার নয়, এটি গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের সেই হাজার হাজার মানুষের, যারা প্রতিনিয়ত আশঙ্কায় দিন কাটায়। রাষ্ট্রের আইনি যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে যাওয়া সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ একটা কাগজের টুকরোর কাছে হেরে যায়। তাদের জীবন গড়ে উঠে বর্ডার এলাকার অনিশ্চিত জীবন, কাঁটাতারের বেড়া এবং প্রশাসনের কড়া নজরদারির এক ভয়াবহ পরিবেশে। কবর থেকে আব্বাজানের হাড় তুলে নিয়ে আমিরুদ্দিন যখন প্যাকাস বোম্বের অঙ্ককারে বসে থাকে, তখন তার মনে হয়—

“দায়িত্বজ্ঞানহীন জন্মদাতা সন্তানকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার আগে একটিবারও যে তার জন্যে একটি সার্টিফিকেট তৈরী রাখার কথা মনে করল না... যার জন্যে পুঞ্জিত হয়েছিল আপন ঔরসজাতের একরাশ মোক্ষম কৈফিয়ত, ঘৃণা, ক্ষোভ আর বুক উজার করা খিঙ্কার, এখন তা একদমকা হু-হু করা কান্না হয়ে বেরিয়ে এলো শুধু।”^২

এখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্ঠুরতাকে উপেক্ষা করে লেখক প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রান্তিক মানুষ আমিরুদ্দিনের চিরকাল বঞ্চিতই থেকে যায়। কিন্তু আমিরুদ্দিন তার বাবার হাড় আঁকড়ে ধরে যখন বলে—

“হু-হু করে বুক ভাঙ্গা কান্না আসে আমিরুদ্দিনের-এক অসহায় জান্তব কান্না। তার কান্নার এই গমকে দু’হাতের পাঁজায় আব্বাজানও যেন হাড়ে হিলে হিলে শব্দ তুলে কাঁদে।”^৩

তখন সেই যন্ত্রণা কেবল একার থাকে না, তা হয়ে যায় সার্বজনীন।

উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্য রঙে ভেজা মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এক দীর্ঘশ্বাসের নাম। এই অঞ্চলের মাটি যেমন আপন, এখানকার মানুষের জীবনসংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামের শিল্পরূপ ছোটগল্পগুলোও তেমনই কণ্টকাকীর্ণ। নাগরিক জীবনের একঘেয়েমি বা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে আড়ালে রেখে, উত্তর-পূর্ব ভারতের গল্পে মুখ্য হয়ে ওঠে অস্তিত্বের লড়াই। নিজেকে রক্ষা করার এই অস্তিত্ব কেবল আইনি নাগরিকত্ব নয়, বরং তা এক আদর্শগত ও নৈতিক অবস্থানের সংকট। অনুপ ভট্টাচার্যের ‘জলোচ্ছ্বাস’ গল্পটি এই সংকটের এক নিদারুণ এবং তাত্ত্বিক আখ্যান। উত্তর-পূর্ব ভারতের

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৯৪৭-এর দেশভাগ এই অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে আমূল বদলে দিয়েছিল। যে মানচিত্র একদিন কাটা হয়েছিল, তার ক্ষত আজও এখানকার জনজীবনে জীবন্ত। ‘জলোচ্ছ্বাস’ গল্পে আমরা দেখি এক আদর্শবাদী মানুষের নৈতিক পতন ও রাজনীতির নামে চলা এক অন্তঃসারশূন্য উন্মাদনার চিত্র। এই গল্পের প্রধান চরিত্র অনিন্দ্যসুন্দর একসময়কার লড়াকু সাংস্কৃতিক কর্মী, যিনি আজ সময়ের স্রোতে খড়কুটোর মতো ভাসছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসে বামপন্থী আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের এক উজ্জ্বল অতীত ছিল, যা অনিন্দ্যসুন্দরের স্মৃতির মণিকোঠায় আজও অমলিন। কিন্তু বর্তমানের ‘জলোচ্ছ্বাস’ বা রাজনৈতিক জোয়ারে সেই আদর্শের নৌকা আজ ডুবন্ত। গল্পের ভাষায় ফুটে ওঠে এক নিদারুণ হাহাকার—

“ঐ আলোয় ঘেরা মঞ্চে উঠে তাকে কথা বলতে হবে, হয়তো গানও শোনাতে হতে পারে। কী গাইবেন তিনি... কী-ই-বা বলবেন কিছুই আসছেনা মগজে ভালমত।”^৪

এই যে মানসিক শূন্যতা, এটি আসলে এক প্রকারের আদর্শিক মৃত্যু। অনুপ ভট্টাচার্য অত্যন্ত নিপুণভাবে দেখিয়েছেন যে, উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাস কেবল ভৌগোলিক বিচ্ছেদের নয়, বরং তা নৈতিক বিচ্ছেদেরও ইতিহাস। অনিন্দ্যসুন্দরের মতো মানুষ, যারা সারা জীবন নিঃস্বার্থভাবে রাজনীতির কালচারাল ফ্রন্টে কাজ করে গেছেন, শেষ জীবনে এসে তাঁরা নিজেদের অপাঙ্কীয় মনে করেন। বর্তমান সময়ের ক্ষমতাগর্বি রাজনীতি কীভাবে শিল্পীকে কেবল একটি ‘শো-পিস’ হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, তা এই গল্পের প্রতিটি ছত্রে পরিস্ফুট। যখন তাঁকে টাউনহলে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, তখন তাঁর মনে হয় তিনি যেন এক সাজানো পুতুল। তাঁর স্মৃতিতে ভেসে আসে সেই উত্তাল দিনগুলো, যখন রাজনীতি ছিল মানুষের মুক্তির পথ, সুর ছিল প্রতিবাদের ভাষা। কিন্তু এখানকার সম্বর্ধনা সভায় তিনি নিজেকে কেবল একজন অসহায় দর্শক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। গল্পের এক জায়গায় পাই—

“যেতে যেতে রীতিমত ঘামছেন অনিন্দ্যসুন্দর। কী করে যে রাজ্যপালের হাত থেকে পটবস্ত্র আর মানপত্র নিলেন যন্ত্রচালিতের মতো...।”^৫

এই যে যান্ত্রিকতা, এটিই আধুনিক রাজনীতির ট্রাজেডি। মানুষের অনুভূতি সেখানে তুচ্ছ, পদ আর পদকই সেখানে অলংকার। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যচর্চায় যেখানে একসময় ‘উদ্বাস্ত সাহিত্য’ একটি ঘরানা তৈরি করেছিল, সেখানে ঘরানা নয়, নিত্যদিনের বিপন্নতা উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায়। বাংলাদেশের সাহিত্যে যেমন একটি সুসংহত জাতীয় পরিচয় এবং মুক্তিযুদ্ধের গর্ব বর্তমান, উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্য সেখানে অনেক বেশি আত্মপরিচয়ের সংকটে ক্লিষ্ট। অনিন্দ্যসুন্দরের সেই নীরব প্রস্থান নির্দেশ করে যে, জলোচ্ছ্বাসের পর যে পলি পড়ে থাকে, তা সবসময় উর্বর হয় না, কখনো কখনো তা কেবল এক পাহাড় সমান বিষাদ আর কাদা রেখে যায়। উত্তর-পূর্ব ভারতের সাহিত্যের সূচনা মূলত ঔপনিবেশিক আধুনিকতার হাত ধরে হলেও, তা পূর্ণতা পেয়েছে দেশভাগ-পরবর্তী যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। আমরা অনিন্দ্যসুন্দরের চোখে দেখি হরবচনদের মতো যুবকদের উত্থান, যারা রাজনীতির নামে কেবল ক্ষমতা ভোগ করে। এই যে প্রজন্মের ব্যবধান এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়, তা এই অঞ্চলের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাত্ত্বিকভাবে দেখলে, এই গল্পটি প্রান্তিক মানুষের সেই গুমরে মরা কান্নার প্রতিচ্ছবি, যারা ভিড়ের মাঝেও একা। অনিন্দ্যসুন্দরের শিল্পীসত্তা আজ বাজারের পণ্য হয়ে উঠেছে, তাঁর গান আজ কেবল উৎসবের অনুষ্ঠান। গল্পের শিরোনাম ‘জলোচ্ছ্বাস’ এক গভীর রূপক বহন করে— যে জোয়ার সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তা আসলে কোনো নতুন সৃষ্টি দেয় না, বরং তা স্মৃতি আর স্বপ্নকে ধ্বংস করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের মানচিত্রে যে ক্ষত তৈরি হয়েছিল, তা কেবল ভূমিতে নয়, মানুষের মনেও। অনিন্দ্যসুন্দরের ঘামভেজা কপাল আর কাঁপা হাতের মধ্যে ধরা থাকে সেই ভূখণ্ডের পরাজয়ের গ্লানি।

ক্ষুধা আর একাকিত্ব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে ‘বংশীর ভাতার’ গল্পে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বংশী বঞ্চিত হওয়া সেই ব্যক্তি, যিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের ভূখণ্ডেরই রূপক। এই অঞ্চলে ভূমিপুত্র এবং বহিরাগতদের যে দ্বন্দ্ব, এবং সেই দ্বন্দ্ব পিষ্ট হওয়া প্রান্তিক মানুষের যে হাহাকার, তা বংশীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছে। গল্পের ভাষায় ফুটে ওঠে এক নিদারুণ রিক্ততা—

“বংশী যে কেন এলো তা নিজেও জানে না। দু’দিনের জমে থাকা ক্ষুধা, নাকি বউ এলো না তার কোন ক্ষত-তা বংশীও জানে না। ক্ষুধাও নতুন নয়-এইসব না ফেরাও নতুন নয়।”^৬

এই যে প্রাত্যহিক অভাব আর না-পাওয়ার বেদনা, এটি আসলে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রান্তিক ইতিহাসেরই প্রতিফলন। ইতিহাস এখানে কেবল সাল-তারিখের সমষ্টি নয়, বরং তা হলো বংশীর মতো মানুষের বাপ-ঠাকুরদাদের মরে যাওয়া এবং ভিটেমাটি হারানোর এক দীর্ঘ ধারা। বংশীর জগত ছোট — গাছতলায় বিছানো ফাঁদ আর উড়ন্ত টিয়ার স্বপ্ন। কিন্তু এই ছোট জগতের বাইরে যে বৃহৎ পৃথিবী, সেখানে সে কেবল একজন ‘অব্রাত্য’। তার কাছে সময় মানে কেবল অন্তহীন অপেক্ষা—

“অপেক্ষা করতে করতে বংশীর পায়ের তলায় দুর্বা গজিয়ে গেছে। যত অপেক্ষাই কর না কেন-এ মেজাজ না হলে এলো না, এলো তো বসল না। যেন বাপের ঠাকুর। বংশীর ভাতের ডেলা। উড়ন্ত ভাতার।”^৭

এই ‘উড়ন্ত ভাতার’ বা উড়ন্ত ভাতের সন্ধানেই কেটে যায় তার জীবন। এখানে ‘ভাতার’ শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক; যা একদিকে অন্ন বা ভরণপোষণকে বোঝায়, অন্যদিকে এক ধরনের নির্ভরতাকে ইঙ্গিত করে। ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য অত্যন্ত নিপুণভাবে দেখিয়েছেন যে, উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাস কেবল ভৌগোলিক বিচ্ছেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সম্পর্কের বিচ্ছেদেরও ইতিহাস। বংশীর জীবনে তার বউয়ের চলে যাওয়া বা না ফেরাটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং তা দারিদ্র্যের এক অনিবার্য পরিণতি। গল্পের এক অত্যন্ত শক্তিশালী উদ্ধৃতি আমাদের শিউরে দেয়—

“নিজের জমিনে চোরের মত ধান কুড়ায় বংশী-জমি আসে না, বাপ, পুত এইসব মরে মরে যায়-আসে না, বউও যায়-আসে না-কোনটাই নতুন নয়।”^৮

এই ‘জমি আসে না’ কথাটির মধ্যে নিহিত আছে ভূমিহীন মানুষের চিরকালীন বঞ্চনা। উত্তর-পূর্ব ভারতের ভূমি সমস্যার ইতিহাস এই একটি বাক্যে লেখক ধারণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যচর্চায় যেখানে একসময় ‘উদ্বাস্তু সাহিত্য’ একটি সুসংহত ঘরানা তৈরি করেছিল, উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে তা ঘরানা নয়, বরং এক নিত্যদিনের বিপন্নতা। বাংলাদেশের সাহিত্যে যেমন একটি সুসংহত জাতীয় পরিচয় এবং মুক্তিযুদ্ধের গর্ব বর্তমান, উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্য সেখানে অনেক বেশি আত্মপরিচয়ের সংকটে ক্লিষ্ট। বংশীর এই একা থাকা এবং টিয়া ধরার ফাঁদ পেতে বসে থাকা আসলে এক ধরনের মরীচিকা পিছু ধাওয়া করা। যখন সূর্য সব তেজ শুষে নেয় এবং তার ফাঁদের আঠা শুকিয়ে যায়, তখন তার অসহায়তা আরও প্রকট হয়—

“আহারে আঠা নাই, পাখী এলে অটকাবে না-না আটকালে সারাদিনমান গেল কেন?”^৯

এই প্রশ্ন শুধু বংশীর একার নয়, এটি সেই প্রান্তিক মানুষের প্রশ্ন যারা সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়েও দিনশেষে রিক্তহস্তে ঘরে ফেরে। বংশী যখন তার শূন্য ভাতের থালার দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন সে আসলে তার অস্তিত্বের শূন্যতাকেই প্রত্যক্ষ করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের মানচিত্রে যে ক্ষত একদিন দেশভাগের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, সেই ক্ষত আজ প্রান্তিক মানুষের জীবনের পাঁজরে শিকড় গেড়েছে। রাষ্ট্র যখন যন্ত্র হয়ে ওঠে এবং মানুষের পরিচয়কে কেবল নথিপত্রে সীমাবদ্ধ করে ফেলে, তখন বংশীর মতো মানুষেরা সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক আদিম অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

অন্যদিকে, দীপক দেবের ‘গুলি অথবা গুলির শব্দ’ গল্পটি এই সংকটের এক নিদারুণ এবং তাত্ত্বিক দলিল। গল্পের শুরুতেই লেখক এক অমোঘ সত্য উচ্চারণ করেছেন—

“এই সকল পাহাড়পুঞ্জের শরীরে যে আকৃতি তার সম্পূর্ণটাই ক্ষুধার। মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপ কলুষিত করেছে বিভিন্নভাবে নীরবতা এবং জীবন। এই সকল পাহাড়পুঞ্জ বারবার আমন্ত্রণ করেছে মানুষকে এবং বারবার বিপর্যস্ত, উলঙ্গ হয়েছে।”^{১০}

এই ‘ক্ষুধা’ শব্দটি কেবল অন্নহীনতার নয়, বরং তা এক সার্বিক বঞ্চনা ও অস্তিত্বের রিক্ততার ইঙ্গিত দেয়। দেবতামুড়া পাহাড়ের নিস্তব্ধতাকে চিরে যখন সেনাবাহিনীর গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়, তখন সেখানকার মানুষের জীবন থমকে যায়। এই গল্পের প্রধান চরিত্র ছোট বালক আঁথিরাই। তার কাছে পাহাড়ের এই রুক্ষ জীবন এবং সেনাবাহিনীর মহড়া কোনো

দেশপ্রেমের অংশ নয়, বরং বেঁচে থাকার এক অদ্ভুত মাধ্যম। সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত সীসার গুলি কুড়ানোই হলো তার উপার্জনের পথ। তার শৈশব আনন্দময় খেলার মাঠ নয়, বরং একটি জীবন্ত রণক্ষেত্র। গল্পের বর্ণনায় পাই—

“রোদ পড়ে চিকচিক এখন। বড়গাড়ীগুলোকে রাতের বেলায় বিড়ালের মতো মনে হয়, শুধু হেডলাইটই চোখে পড়ে।”^{১১}

এই সহজ শৈশবীয় কল্পনার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক গভীর অনিশ্চয়তা। আঁখিরাইয়ের কাছে রাষ্ট্র বা সীমান্তরক্ষা কেবল কিছু ধাতব বস্তুর সমষ্টি—

“ব্যবহৃত সীসার গুলি চোখে ভাসে। ধরতে পারলে, কুড়াতে পারলে অনেক পয়সা আসবে হাতে।”^{১২}

এই দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

বঞ্চিত আঁখিরাইয়ের মতো বালকদের স্থান ইতিহাসের পাতায় হয় না, তারা কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের ‘কোল্যাটেরাল ড্যামেজ’ বা অনিচ্ছাকৃত ক্ষতি হিসেবে গণ্য হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এদের জীবনকে এক ধরণের আবদ্ধ মানসিকতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, যেখানে মহড়ার সময় কানে পাতা গুঁজে শুয়ে থাকতে হয়। গল্পের এক মর্মান্তিক দৃশ্য—

“কান থেকে পাতা দুটো খুলে ফেললেই শুধু বাতাসের শব্দ পায় আঁখিরাই। এবার হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে থাকে সে। না কোনও শব্দ নেই গুলির। মহড়া শেষ। রোজইতো প্রায় এসময়ই শেষ হয়।”^{১৩}

এই ‘মহড়া শেষ’ হওয়াটাই ছিল তার জীবনের শেষ মুহূর্তের শুরু। যখন সে হেঁচড়ে হেঁচড়ে গুলি জোগাড় করতে শুরু করে, তখন সে আসলে নিজের মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে যায়। ইতিহাস এখানে কেবল রাজবংশের কাহিনী নয়, বরং তা হলো বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের টহল এবং দাঙ্গার রক্তশ্রোত। ‘গুলি অথবা গুলির শব্দ’ গল্পে ইতিহাস বর্তমান হয়ে আসে বুলেটের শব্দের মাধ্যমে। আঁখিরাই যখন গুলবিদ্ধ হয়—

“একটি মরা গাছের মতো ধপ করে নিচে গড়িয়ে পড়ে আঁখিরাই। হাতের মুঠোভর্তি মরা গুলি, রক্তে ভরে যেতে থাকে লালমাটি।”^{১৪}

তখন সেই লাল মাটি কেবল একটি ভূগোল নয়, বরং তা হয়ে ওঠে এক ঐতিহাসিক যন্ত্রণার রূপক। উত্তর-পূর্ব ভারতের মানচিত্রে এরকম অসংখ্য আঁখিরাই প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাচ্ছে যাদের খবর মূলধারার মিডিয়ায় বা সাহিত্যে খুব কমই পৌঁছায়।

কুমার অজিত দত্তের ‘কলাবতীর বারোমাস্যা’ গল্পে আমরা দেখি এক রিক্ত, নিঃস্ব মানুষের অস্তিত্বের লড়াই, যেখানে ক্ষুধা আর নগরজীবনের নিষ্ঠুরতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কলাবতী কেবল একজন ব্যক্তি নয়, সে উত্তর-পূর্ব ভারতের সেই উদ্বাস্ত ও প্রান্তিক ভূখণ্ডেরই রূপক যা বারবার লাঞ্চিত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসে দেশভাগ-পরবর্তী যে জনশ্রোত অসম বা ত্রিপুরার শহরগুলোতে আছড়ে পড়েছিল, এবং সেই ভিড়ে মিশে যাওয়া মানুষের যে হাহাকার, তা কলাবতীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছে। শহরের ঝলমলে আলোর নিচে যে অন্ধকার গলি থাকে, সেখানেই কলাবতীর বাস। তার কাছে শহর মানে মুক্তি নয়, বরং এক দীর্ঘস্থায়ী অবমাননা। যখন সে ক্ষুধার তাড়নায় শহরের সাবওয়েতে ভিক্ষা করতে নামে, তখন তার চতুর্দিকের জগতটি কেবল কিছু চলমান পায়ে সমষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। গল্পের বর্ণনায় ফুটে ওঠে এক নিদারুণ দৃষ্টিভঙ্গি—

“পা। শুধু পা। রাশি রাশি পা। এগিয়ে যায়। কারো কারো পা হঠাৎ হঠাৎ একটু থামে। পয়সা পড়ে।

আবাব চলতে থাকে। পা-পায়ের জুতো-শব্দ-কত রকমের-কত ঢংয়ের।”^{১৫}

এই যে মানুষের মুখ হারিয়ে কেবল পায়ে পর্যবসিত হওয়া, এটি আসলে একধরণের বিচ্ছিন্নতাবোধ বা ‘অ্যালিয়েনেশন’-এর চরম বহিঃপ্রকাশ। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রান্তিক মানুষের কাছে রাষ্ট্র বা সমাজ যখন কেবল একটি যন্ত্র হয়ে ওঠে, তখন মানুষের মানবিক সত্তা এভাবেই লুপ্ত হয়। কুমার অজিত দত্ত অত্যন্ত নিপুণভাবে দেখিয়েছেন যে, মানুষের অস্তিত্ব যখন কেবল অল্পসংস্থানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন তার জগতটি পশুত্বের কাছাকাছি চলে যায়। কলাবতীর কাছে এই চলমান পাগুলো কোনো মানুষের নয়, বরং পশুর মতো মনে হয়—

“কুনোটা কুইল্যাব বলদার মতন, কুনোটা গাই-বাছুবের, আবাব কুনোটা ঘোড়ার মতন ঠকঠক কইবা ছুটে।”^{১৬}

ক্ষুধা এখানে নিজে থেকেই এক শিল্পী হয়ে ওঠে, যা পৃথিবীকে নতুন করে চিনতে শেখায়। একজন ফটোগ্রাফার যখন কলাবতীর সেই কঙ্কালসার ক্ষুধার্ত মুখের ছবি তোলে এবং তা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হয়, তখন সেই শৈল্পিক নিষ্ঠুরতা আমাদের বিদ্ধ করে। এখানে শিল্প আর বাস্তবতার যে সংঘাত, তা উত্তর-পূর্ব ভারতের সাহিত্যের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইতিহাস এখানে কেবল সাল-তারিখের সমষ্টি নয়, বরং তা হলো কলাবতীর বাবার মতো মানুষের মর্যাদাহীন মৃত্যু। গল্পের এক অত্যন্ত শক্তিশালী ও মর্মস্পর্শী উদ্ধৃতি আমাদের শিউরে দেয় -

“মুনসিপুলিটির জমাদাররা বাপটাকে যখন মরা গরুর মতো একটা বড় লাঠিতে দুপা বেঁধে ঝুলোতে ঝুলোতে নিয়ে যাচ্ছিল ... কলাবতী সেদিন খুব কেঁদেছিল।”^{১৭}

মনুষ্যত্বের এই যে চরম অসম্মান, এটিই মানচিত্রের সেই ক্ষত যা কোনোদিন শুকোবার নয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসের যে অনিশ্চয়তা, তা এই ‘মরা গরুর মতো’ ঝুলতে থাকা লাশের মধ্যেই নিহিত। কলাবতী যখন পুলিশের লাঠির ঘা খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং আত্ননাদ করে—

“কলাবতী ‘মাগো’ বলে কাতরাতে কাতরাতে মাটিতে অর্ধশয়ান। পুলিশটা বিরক্তিতে একটা জোর লাথি ঝেড়ে দেয় কলাবতীর তলপেটে...”^{১৮}

তখন সেই যন্ত্রণায় কোনো ভৌগোলিক সীমানা থাকে না। এটি সার্বজনীন এক লাঞ্ছনার ছবি। কুমার অজিত দত্তের এই গল্পটি আমাদের বাধ্য করে সেই সব মানুষের পাশে দাঁড়াতে যারা সময়ের জলোচ্ছ্বাসে নিজেদের শিকড় হারিয়ে ফেলছে। অন্ত্যজ জীবনের, প্রান্তিক আত্মার এই তালাশ কেবল শোকগাথা নয়, বরং এটি নীরবে ভয়ংকর প্রতিবাদ। ক্ষয়ে যাওয়া মানচিত্রের ক্ষত না শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই, আর সেজন্যই বারবার এই ধরণের ছোটগল্পগুলো আমাদের চেতনার মূলে কশাঘাত করে যাবে। কলাবতীর সেই শূন্য দৃষ্টি আর ‘পা’ গুলোর শব্দ পাঠককে এক অস্তিত্বহীনতার গভীর উপলব্ধিতে নিমজ্জিত করে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে উত্তর-পূর্ব ভারতের দিকে তাকালে দেখা যায়, দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো এক চরম বিষন্নতার মধ্য দিয়ে গেছে। সুবিমল রায় তাঁর ‘অন্যপথ’ গল্পে সেই অস্থিরতাকেই এক শিল্পীর বিপন্নতার মোড়কে তুলে ধরেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিত্যানন্দ কেবল একজন প্রতিমা শিল্পী নন, তিনি সেই প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি যাদের জীবন রাষ্ট্র ও সমাজের উদাসীনতায় ক্রমশ ‘অন্যপথ’ বা আত্মহননের দিকে এগিয়ে যায়। উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কারিগরদের যে বঞ্চনা, তা এই গল্পে অত্যন্ত প্রখরভাবে ধরা পড়েছে। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি এক নিদারুণ অর্থনৈতিক টানাপোড়েন—

“গত অমাবস্যায় বাজারের ব্যবসায়ী সমিতি একটা কালীমূর্তি তৈরী করিয়ে নিয়েছিল, অথচ আজো দামটা পাওয়া গেল না; আজ এক পূর্ণিমা। ঠিক পনেরো দিন কাটলো নিত্যানন্দ দুবার বাজারে গিয়েছিল ভরা দুপুরের খোদে।”^{১৯}

এই যে দীর্ঘ অপেক্ষা এবং পরিশ্রমের সঠিক মূল্য না পাওয়া, এটি আসলে উত্তর-পূর্ব ভারতের অবহেলিত ভূখণ্ডের এক জলজ্যান্ত চিত্র। আসলে এখানকার ইতিহাস নিত্যানন্দের মতো মানুষের ক্ষুধার ইতিহাস। সুবিমল রায় অত্যন্ত নিপুণভাবে দেখিয়েছেন যে, মানুষের শিল্পসত্তা যখন ক্ষুধার কাছে পরাজিত হয়, তখন তার অস্তিত্বের সংকট কতটা গভীর হতে পারে। নিত্যানন্দের সংসারে ক্ষুধা এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করে, যা তার দাম্পত্য ও মানসিক স্থিরতাকে নষ্ট করে দেয়। গল্পের আকর্ষণীয় মুহূর্তে দেখা যায় —

“নিত্যানন্দ দেখল ছবি কালিমাখা ভাতের হাঁড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। ভাঙা হাঁড়ির টুকরো বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত ঘরে। সামান্য কটা ভাত বিক্ষিপ্ত হলো। লজ্জায় নিত্যানন্দের মুখ থেকে শুধু অস্ফুট আওয়াজ বেরোল, ভাত আর ছিল না আমি বুঝতে পারিনি ছবি।”^{২০}

এই ‘ভাত’ শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অস্তিত্বের আদিমতম হাহাকার। উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসে দারিদ্র্য ও অভাব চিরকালই সাহিত্যের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে দেখলে, নিত্যানন্দের এই সংকট লুই আলথুসার বর্ণিত ‘আইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস’-এর শিকার হওয়া মানুষের গল্প, যেখানে ব্যবস্থা তাকে শ্রম দিতে বাধ্য করে কিন্তু তার বিনিময়ে তাকে জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগ দেয় না। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যচর্চায় যেখানে একসময় নাগরিক মনস্তত্ত্ব প্রধান ছিল, উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে তা এক অস্তিত্বহীনতার হাহাকার। শিল্প যখন নিত্যানন্দের কাছে অবহেলিত হয়, তখন সে আসলে ছন্ন ছাড়া ভিটেমাটিহীন উদ্বাস্তু জীবনেরই এক সম্প্রসারিত রূপকে দেখতে পায়। লেখন সুবিমল রায় তাঁর শৈল্পিক মুসিয়ানায় দেখিয়েছেন যে, একজন শিল্পী যখন তার সম্মানের সাথে আপস করতে পারে না, তখন সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর পথ বেছে নেয়। গল্পের শেষে যখন নিত্যানন্দকে পাওয়া যায়—

“পরদিন ভোরে পাওয়া গিয়েছে গাছের ডালে। সমস্ত দারিদ্রের...”^{২১}

এই অসমাপ্ত বাক্যটিই বুঝিয়ে দেয় যে প্রান্তিক মানুষের দাবিগুলো সমাজ কখনোই মেটাতে পারে না। এই ‘অন্যপথ’ আসলে কোনো পরাজয় নয়, বরং এক নিষ্ঠুর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিঃশব্দ প্রতিবাদ। উত্তর-পূর্ব ভারতের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং সীমান্তের অনিশ্চয়তা এখানকার মানুষের মানসিকতায় যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করেছে, ‘অন্যপথ’ গল্পে নিত্যানন্দের চরিত্রটি তার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সুবিমল রায়ের এই লেখনী পাঠককে বাধ্য করে সেই সব মানুষের চোখের দিকে তাকাতে যারা প্রতিদিন নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে মানচিত্রের ধূসর প্রান্তে। এই আখ্যান তাই কেবল একটি ছোটগল্প নয়, এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের এক ক্ষতবিক্ষত সময়ের বিশ্বস্ত দলিল, যা মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বের কথা বলে এবং পাঠককে এক গভীর আত্মানুসন্ধানের পথে পরিচালিত করে। সুবিমল রায়ের ‘অন্যপথ’ গল্পে আমরা দেখি নিত্যানন্দের মতো কারিগরের জীবনসংগ্রাম। বাজারে মন্দা এবং বকেয়া টাকা না পাওয়ার ফলে তার সংসার যখন অনাহারে ধুঁকছে, তখন তার আত্মসম্মানবোধ তাকে কুরে কুরে খায়। গল্পের শেষে যখন তার মৃতদেহ গাছের ডালে পাওয়া যায়, তখন বোঝা যায় যে প্রান্তিক মানুষের কাছে সম্মান আর অন্ন যখন একসাথেই হারিয়ে যায়, তখন মৃত্যুই হয়ে ওঠে একমাত্র ‘অন্যপথ’। ছবি যখন কালিমাখা ভাতের হাঁড়ি ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তখন সেই শব্দের মধ্যে এক দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশিত হয়। নিত্যানন্দের উপলব্ধি —

“ভাত আর ছিল না আমি বুঝতে পারিনি ছবি।”^{২২}

এই অমোঘ সত্য আমাদের সমাজের বৈষম্যকেই প্রকট করে তোলে।

মানবিকতার এক অনন্য রূপ দেখা যায় বিমল চৌধুরীর ‘অনুভাব’ গল্পে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মকবুল কেবল একজন সাধারণ যুবক নয়, সে সেই বিপন্ন প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি যাদের জীবন রাষ্ট্র ও ধর্মের উগ্র উন্মাদনায় প্রতিনিয়ত বিপন্ন হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশভাগ-পরবর্তী যে মানসিক ক্ষত, তা এই গল্পে অত্যন্ত প্রখরভাবে ধরা পড়েছে। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি এক নিদারুণ পরিবেশ—নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে থাকা মকবুল। বৃষ্টির আবহে শুরু হওয়া গল্পটি ধীরে ধীরে এক থমথমে পরিস্থিতির দিকে মোড় নেয়। দাঙ্গার বিভীষিকা মকবুলকে এক চরম সংকটের মুখে দাঁড় করায়। গল্পের ভাষায় পাই—

“মকবুলের অসাড় দেহের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত প্রবাহ উদ্দাম হয়ে উঠলো ... স্টেশনের দিক থেকে একদল লোক এদিকেই আসছে, সেই ঘাতকেরা নিশ্চয়-যারা জানের বদলে জান নেবার জন্য ঘুরছে।”^{২৩}

এই যে প্রাণের ভয় এবং চারপাশের মানুষের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা, এটি আসলে উত্তর-পূর্ব ভারতের অবহেলিত ও খণ্ডিত জনপদের এক জীবন্ত চিত্র। বিমল চৌধুরী অত্যন্ত নিপুণভাবে দেখিয়েছেন যে, মানুষের মানবিক সত্তা যখন হিংসার কাছে পরাজিত হতে চায়, তখনই জন্ম নেয় এক পরম ‘অনুভাব’ যা সব বিভেদকে ছাপিয়ে যায়। মকবুল যখন একটি পরিত্যক্ত হিন্দু শিশু ‘খোকন’কে খুঁজে পায়, তখন তার নিজের প্রাণের ভয়ের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে শিশুটির প্রাণ রক্ষা করা। দাঙ্গার বীভৎসতার মাঝেও মকবুলের এই অনুভূতি —

“কিন্তু সেই মুহূর্তে, ‘মা-আ-গো’ কচি গলার শেষ আর্ত চিৎকারে মকবুলের হৃৎপিণ্ডের রক্ত ছলাৎ করে উঠলো ... ঈশ্বর তারঙ্গ চরাচরময় ছড়িয়ে পড়লো যেন এ করুণ মর্মভেদী আত্মহান।”^{২৪}

এটিই উত্তর-পূর্ব ভারতের সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। তত্ত্বের আলোকে দেখলে, মকবুলের এই চরিত্রটি এমিল দুর্খেইমের ‘কালেক্টিভ কনশাসনেস’ বা যৌথ চেতনার এক মানবিক বিবর্তন, যেখানে ধর্ম নয়, বরং অন্যের যন্ত্রণাকে নিজের বলে অনুভব করাই প্রকৃত ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যচর্চায় যেখানে একসময় উদ্বাস্ত সমস্যা কেবল স্মৃতিকাতরতায় বন্দি ছিল, উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে তা এক রক্তাক্ত বর্তমান। বাংলাদেশের সাহিত্যে যেমন একটি সুসংহত জাতীয় পরিচয় বর্তমান, উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্য সেখানে অনেক বেশি বিচ্ছিন্নতাবোধ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মাঝেও মিলনের পথ খোঁজে। খোকনকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়ার পর মকবুলের মনে যে প্রশান্তি আসে, তা কোনো রাষ্ট্রের সীমানার তোয়াক্কা করে না। গল্পের শেষে লেখক যখন বলেন –

“মায়ের কোলে গিয়ে খোকনের মুখের খুশির ঝলক আর মায়ের চোখ থেকে ঝরে পড়া আনন্দাশ্রু-প্রতিবিম্বিত এবং সংক্রামিত হলো মকবুলের মুখে-চোখেও।”^{২৫}

লেখক এই উক্তির মধ্যে দিয়ে প্রান্তিক মানুষের হারানো মানবিকতার সন্ধান করেছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং সীমান্তের অনিশ্চয়তা এখানকার মানুষের মানসিকতায় যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করেছে, ‘অনুভাব’ গল্পে মকবুলের চরিত্রটি তার এক শ্রেষ্ঠ উত্তর। ইতিহাস শুধুমাত্র বইয়ে লিখিত কোনো তথ্য নয়, বরং তা মকবুলের ভিজে জবজবে গায়ের কাপড়ের মতোই শরীরের সাথে লেপ্টে থাকা এক বাস্তবতা। বিমল চৌধুরীর এই লেখনী পাঠককে বাধ্য করে সেই সব মানুষের চোখের দিকে তাকাতে যারা রাজনীতির বিষবাস্পের মাঝেও মানুষের পরিচয়কে বড় করে দেখে।

শেষ হয়ে যাওয়া সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং ইতিহাসের এক বিষম ছায়া দেখা যায় সুব্রত কুমার রায়ের ‘দেওলা’ গল্পে। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখতে পাই, এই অঞ্চলের অভিজাত ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে থাকে। যে মানচিত্র একদিন কাঁটাতারে খণ্ডিত হয়েছিল, তার ক্ষত কেবল ভূমিতে নয়, মানুষের ভিটেমাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিকড় গেড়েছে। ‘দেওলা’ গল্পে আমরা দেখি এক ক্ষয়ে যাওয়া বংশের শেষ প্রতিনিধি ভুবনমোহন দাসের অন্তহীন নিঃসঙ্গতা। গল্পের শুরুতেই লেখক এক অমোঘ বিষম্বতা ছড়িয়ে দেন—

“রাত্রির পাতাঝড়ের অবশেষ নিয়ে জেগে উঠছে ভিটেমাটি-সহ তিনপোতার ঘর। তিনশো বছরের ইতিহাসের নিঃসঙ্গতার কোন সাক্ষী নেই, শুধু ভিটের খুঁটি চেপে ধরা সাধু আমগাছটা ছাড়া। তবু ক্ষয়ের চিহ্ন তিনপোতার ঘরগুলোয় বিধবার মতো প্রকাশ্য।”^{২৬}

এই ‘বিধবার মতো প্রকাশ্য’ ক্ষয় আসলে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের সেই সব জনপদের রূপক, যারা ইতিহাসের বাঁকবদলে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। ভুবনমোহন এই বংশের শেষ সামন্ত ভূস্বামী হলেও বর্তমানের রুঢ় বাস্তবতা তাকে একফালি জমিতে বেগুন চাষ করতে বাধ্য করে, যেখানে তাকে নিজের হাতেই কীটনাশক ছিটাত হয়। এই পতন কেবল একজন ব্যক্তির নয়, বরং একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের। ভুবনমোহন যখন পুকুরের শ্যাওলারং জলের ওপর ভাসমান লাল শাড়ির কিছুটা অংশ দেখেন, তখন তাঁর স্মৃতিতে ভেসে আসে অনেক অনেক দিন আগে ঘটে যাওয়া এক মৃত্যুর কথা। এই মৃত্যু কেবল এক নারীর নয়, বরং একান্তবর্তী পরিবারের সেই আভিজাত্যের মৃত্যু যা একসময় উত্তর-পূর্ব ভারতের সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত। গল্পের এক জায়গায় পরানদাদীর স্মৃতিচারণায় ফুটে ওঠে হত গৌরবের বিষাদ—

“অই ঘরটা তো পরে অয়। আসাম থাকি হান্তির পিঠো করিয়া সোনার কাট আনাইয়া। তখন কাটের দোতালা আছিল।”^{২৭}

এই ‘হান্তির পিঠে করে সোনার কাট’ আনার আভিজাত্য আজ কেবল গল্পের খোরাক, বাস্তবে সেখানে কেবল পলেন্তারা খসা দেওয়াল আর শ্যাওলা ধরা পুকুরঘাট। তত্ত্বিকভাবে দেখলে, ভুবনমোহনের এই অস্তিত্বের সংকট আসলে এক ধরণের ‘আইডেন্টিটি ক্রাইসিস’, যেখানে সে না পারছে অতীতকে আঁকড়ে ধরতে, না পারছে বর্তমানের প্রান্তিকতাকে মেনে নিতে। উত্তর-পূর্ব ভারতের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং সীমান্তের অনিশ্চয়তা এখানকার মানুষের মানসিকতায় যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করেছে, ‘দেওলা’ গল্পে ভুবনমোহনের নিঃসঙ্গ পদচারণা তার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যচর্চায় যেখানে একসময় নগরজীবনের টানাপোড়েন প্রধান ছিল, উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে তা এক শিকড়হীনতার হাহাকার।

বাংলাদেশের সাহিত্যে যেমন একটি সুসংহত জাতীয় পরিচয় বর্তমান, উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্য সেখানে অনেক বেশি স্মৃতিভারাতুর ও ক্ষীয়মাণ। গল্পের রহস্যময় পরিবেশে যখন ল্যাংটা গোঁসাই বা কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর প্রসঙ্গের অবতারণা হয়, তখন তা এক অলৌকিক আবহের সৃষ্টি করে, যা আসলে মানুষের অসহায়ত্বেরই প্রতিফলন। রাষ্ট্র যখন মানুষের রক্ত-মাংসের সম্পর্কের চেয়ে আইনি সীমানাকে বড় করে দেখে, তখন মানুষ অলৌকিকত্বের আশ্রয়ে নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা খুঁজতে চায়। ভুবনমোহন চেষ্টা করেন গুরুর কার্যকারণের রহস্য ভেদ করতে, কিন্তু ইতিহাসের নির্মম রহস্যের কাছে তিনি পরাস্ত হন। গল্পের শেষে প্রাচীন পুকুরের ঝামা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভুবনমোহনের যে উপলব্ধি— তা আসলে এক পরম শূন্যতারই নামান্তর।

সমাজ বাস্তবতার এক ভিন্ন স্বর লক্ষ্য করা যায় বনমালী গোস্বামীর ‘বিঙ ও মুরগিছানা’ গল্পে। এই গল্পে আমরা দেখি এক অবোধ শিশুর জগতের সাথে রাষ্ট্রের নিষ্ঠুর বাস্তবতার সংঘাত। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিঙ - এক আদিবাসী বালক, যার জগত তার পোষা মুরগিছানাটিকে ঘিরে আবর্তিত। কিন্তু এই সরল জগতের ওপর ছায়া ফেলে এক বড় মাপের রাজনৈতিক ও সামরিক বাস্তবতা। গল্পের শুরুতেই লেখক এক বিষম ও রুক্ষ পরিবেশের চিত্র আঁকেন, যা উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ী জনপদের এক অকৃত্রিম ছবি। এই গল্পে আমরা দেখি একরঙা মুরগিছানাকে পাহাড়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে, এটি আসলে প্রান্তিক মানুষের কাছে তার যৎসামান্য সম্পদটুকুর গুরুত্বকেই তুলে ধরে। উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসে সামরিক উপস্থিতি এবং সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের টানাপোড়েন এই গল্পে এক প্রতীকী মাত্রা পায়। বিঙ-এর মুরগিছানাটি যখন হারিয়ে যায় বা বিপন্ন হয়, তখন তা কেবল একটি প্রাণীর হারিয়ে যাওয়া নয়, বরং তা এক আদিম অস্তিত্বের সংকটের ইঙ্গিত দেয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাসে ‘মানচিত্রের ক্ষত’ কেবল বর্ডার বা কাঁটাতারে সীমাবদ্ধ নয়, তা ছড়িয়ে আছে পাহাড়ের আনাচে-কানাচে থাকা প্রতিটি কুঁড়েঘরে। গল্পে দেখা যায়, রাষ্ট্র শুধু পাহাড়ে অবস্থিত গাছগুলোকে চেনে কিন্তু মানুষকে চেনে না, চেনে ভোটের বা বিদ্রোহীদের। এই যে মানুষকে কেবল সংখ্যা বা সংজ্ঞায়িত ছাঁচে ফেলে দেখার প্রবণতা, এটিই উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসের ট্রাজেডি। অরুপ বৈশ্য অত্যন্ত নিপুণভাবে দেখিয়েছেন যে, বিঙ-এর কাছে যে মুরগিছানাটি তার খেলার সাথি, রাষ্ট্রের কাছে তা হয়তো কেবল এক তুচ্ছ অবশিষ্টাংশ। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যচর্চায় যেখানে একসময় নাগরিক মনস্তত্ত্ব প্রধান ছিল, উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে তা এক অস্তিত্বহীনতার হাহাকার এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টাকে চিত্রিত করে। বাংলাদেশের সাহিত্যে যেমন একটি সুসংহত জাতীয় পরিচয় বর্তমান, উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্য সেখানে অনেক বেশি বিচ্ছিন্নতাবোধ ও অস্তিত্বের লড়াইয়ে ক্লিষ্ট। গল্পের এক অত্যন্ত শক্তিশালী মুহূর্তে দেখা যায় বিঙ-এর অসহায়তা। বুটের শব্দে চাপা পড়ে যায় বিঙের মুরগিছানা। এখানে ‘বুটের শব্দ’ আসলে এক সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রযন্ত্রের রূপক, যা ক্ষুদ্র অস্তিত্বের কোনো পরোয়া করে না। ইতিহাস এখানে বিঙ-এর কান্নার মতোই প্রখর ও জীবন্ত। অরুপ বৈশ্যের এই লেখনী পাঠককে বাধ্য করে সেই সব মানুষের চোখের দিকে তাকাতে যারা রাজনীতির বড় বড় আলোচনার নিচে চাপা পড়ে যায়।

আমরা পরিশেষে এসে বলতে পারি, উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্য শুধুমাত্র বিনোদন দেওয়ার মাধ্যম নয়, বরং নিজের বিপন্ন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অনিবার্য লড়াই। ‘কলাবতীর বারোমাশ্যা’ থেকে ‘বিঙ ও মুরগিছানা’ কিংবা ‘আব্বাজানের হাড়’ থেকে ‘গুলি অথবা গুলির শব্দ’— এই প্রতিটি আখ্যানই আসলে উত্তর-পূর্ব ভারতের মানচিত্রের একেকটি গভীর ও রক্তাক্ত ক্ষতকে উন্মোচিত করে। ১৯৪৭-এর দেশভাগ এই অঞ্চলের মানুষের মনে যে স্থায়ী বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছিল, তার জের ধরে তৈরি হওয়া উদ্বাস্তু সমস্যা, নাগরিকত্ব সংকট, সামরিকায়ন এবং চরম প্রান্তিকতা এখানকার সাহিত্যের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। আলোচ্য গল্পগুলোতে আমরা দেখেছি যে ‘প্রান্তিকতা’ এখানে কেবল একটি অভিধানিক শব্দ নয়; বরং তা আমিরুদ্দিন মতো আব্বাজানের হাড় আঁকড়ে ধরে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণের এক নিদারুণ যন্ত্রণা অথবা আঁখিরাইয়ের মতো গুলির শব্দের মাঝে শৈশব হারানোর এক মর্মান্তিক বাস্তবতা। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই ছোটগল্পকারগণ মানচিত্রের ক্ষতকে সাহিত্যের মোড়কে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেননি, বরং তাকে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। ‘দেওলা’র ক্ষয়িষ্ণু ঐতিহ্য কিংবা ‘বংশীর ভাতার’-এর ক্ষুধার জ্বালা আসলে এক বৃহৎ সামাজিক অবক্ষয় ও বঞ্চনারই প্রতিচ্ছবি। এই গল্পগুলো ‘সাবঅল্টার্ন’ বা প্রান্তিক মানুষের অবদমিত কণ্ঠস্বর, যারা রাষ্ট্রের নথিপত্রে ব্রাত্য

হলেও সাহিত্যের প্রতিটি ছত্রে অত্যন্ত জীবন্ত এবং প্রতিবাদী। রাষ্ট্র যখন মানুষের মানবিক সম্পর্কের চেয়ে আইনি সীমানাকে বেশি গুরুত্ব দেয়, তখন সাহিত্যই তার রক্ত-মাংসের হাহাকার ও আত্মপরিচয়কে পরম মমতায় আগলে রাখে। পরিশেষে বলা যায়, উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা ছোটগল্প কেবল একটি অঞ্চলের সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা বিশ্বজনীন এক মানবিক সংকটের মহাকাব্য। বিপন্ন অস্তিত্বের এই যে দীর্ঘ যাত্রা এবং প্রান্তিক আত্মার যে আকুল অন্বেষণ, তাই এই সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যের মূল ধারার সমান্তরালে এক অনন্য ও অপরিহার্য মর্যাদা দান করেছে। এই গল্পগুলো আমাদের প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেয় যে, রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তনশীল হলেও মানুষের অস্তিত্বের শিকড় ছিঁড়ে ফেলা অসম্ভব এবং সেই শিকড়ের আদিম ও অকৃত্রিম ঘ্রাণ খুঁজে পাওয়াই এই সামগ্রিক আলোচনার সার্থকতা। মানচিত্রের ক্ষত ছাপিয়ে এখানে শেষপর্যন্ত মানুষের জয়গানই অনুরণিত হয়েছে, যা পাঠককে এক অস্তিত্বহীনতার অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশা দেয়।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, অনুপ এবং দেব শুভ্রত (সম্পা.) : উত্তরপূর্বের নির্বাচিত বাংলা গল্প, আগরতলা, ত্রিপুরা, অক্ষর প্রকাশনী, ১৯৬০, পৃ. ১০৪
২. তদেব, পৃ. ১০৫
৩. তদেব, পৃ. ১০৪
৪. তদেব, পৃ. ৩১৪
৫. তদেব, পৃ. ৩১৪
৬. তদেব, পৃ. ১৬৪
৭. তদেব, পৃ. ১৬১
৮. তদেব, পৃ. ১৬৪
৯. তদেব, পৃ. ১৬৪
১০. তদেব, পৃ. ২৫৮
১১. তদেব, পৃ. ২৫৮
১২. তদেব, পৃ. ২৬২
১৩. তদেব, পৃ. ২৬৭
১৪. তদেব, পৃ. ২৬৮
১৫. তদেব, পৃ. ৯২
১৬. তদেব, পৃ. ৯২
১৭. তদেব, পৃ. ৯৪
১৮. তদেব, পৃ. ৯৬
১৯. তদেব, পৃ. ২০০
২০. তদেব, পৃ. ২০৭
২১. তদেব, পৃ. ২০৭
২২. তদেব, পৃ. ২০৭
২৩. তদেব, পৃ. ১৪৬
২৪. তদেব, পৃ. ১৪৬
২৫. তদেব, পৃ. ১৪৬
২৬. তদেব, পৃ. ৭৩

২৭. তদেব, পৃ. ৭৩

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

ভট্টাচার্য, অনুপ ও দেব শুভ্রত (সম্পা.) : *উত্তরপূর্বের নির্বাচিত বাংলা গল্প*, আগরতলা, ত্রিপুরা, অক্ষর প্রকাশনী, ১৯৬০

সহায়ক গ্রন্থ :

বাংলা :

রায়, ড. নরেন্দ্রনাথ ও বর্মণ, প্রসন্ন কুমার (সম্পা.) : *উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাস*, কলকাতা, ছায়া পাবলিকেশন, ২০২৩

আর রহমান, হাবিব (সং. ও সম্পা.) : *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব: ধ্রুপদী ও আধুনিক*, ঢাকা, কথাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি: ২০১৪

ইমরান, মাসউদ (সম্পা.) : *ক্রিটিক্যাল তত্ত্বচিন্তা*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১০

রহমান, আনিসুর : *নিম্নবর্গের ইতিহাস এবং প্রাক-মহাশ্বেতা পর্বের বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৫

ইংরেজি :

Basak, Radha govinda : *THE HISTORY OF NORTH-EASTERN INDIA*, Calcutta, The book company, LTD, 1934